দুই বাংলার শিশু-কিশোর পত্রিকার ২০০ বছরের
নির্বাচিত গল্প সংগ্রহ

দোলাচাঁপা ১৪২৫

ছোটোদের গল্পবার্ষিকী

সম্পাদক
অশোককুমার মিত্র

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

অলংকরণ
শংকর বসাক

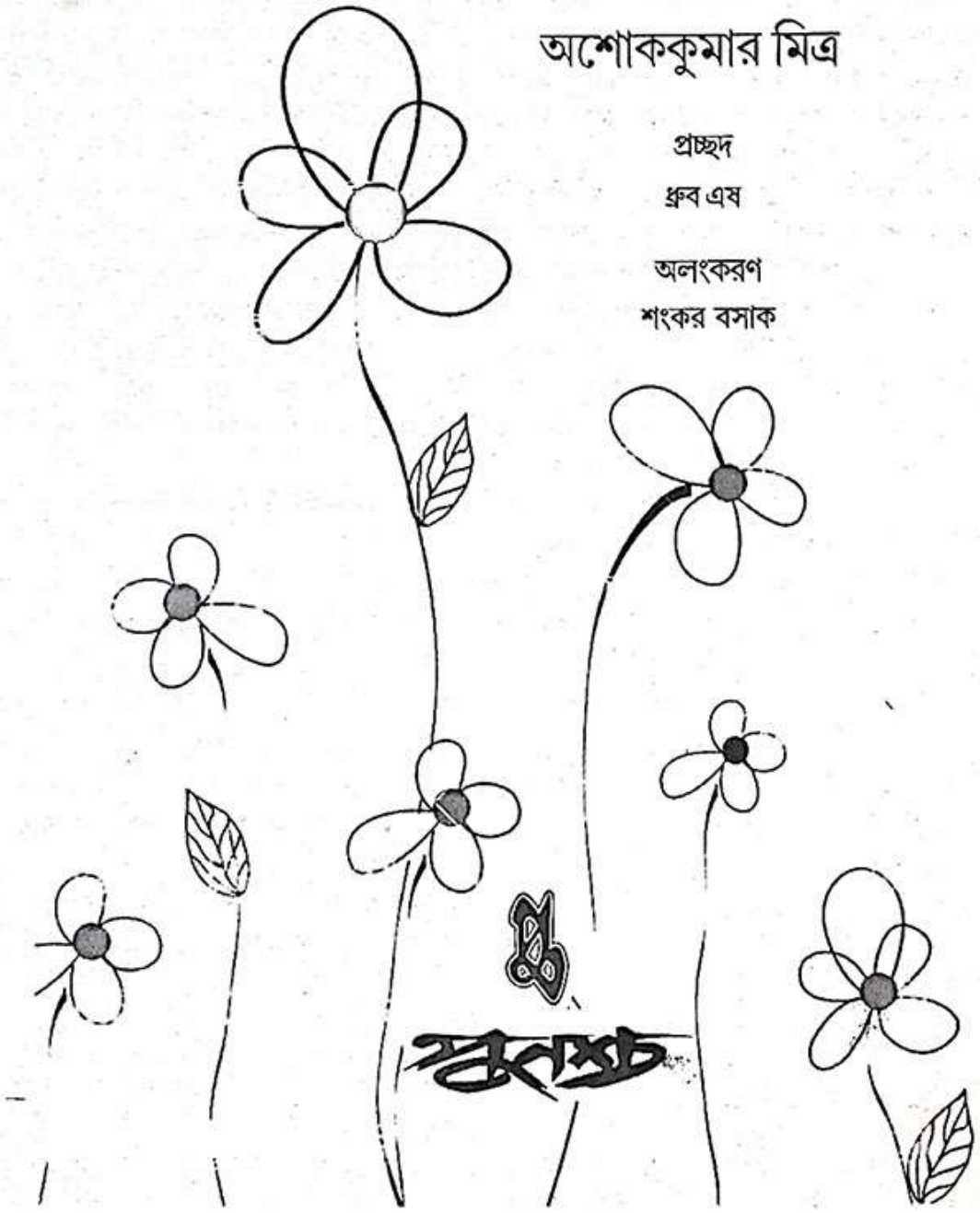

পুনশ্চ

ঝালা পালা

১৮১৮-র এপ্রিল মাস। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে বেরুল এক মাসিক পত্রিকা—যার নাম 'দিগ্‌দর্শন'। পরিচয় পত্রে লেখা—যুবজনের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ। অথচ প্রথম রচনাটি ছিল আমরিকার দর্শনি বিষয়ে নিবন্ধ। যুবলোক বলতে স্কুল পাঠ্য বালকদের কথাই ভেবেছেন উদ্যোক্তারা। সদ্য গঠিত (১৮১৪) স্কুল বুক সোসাইটি এই পত্রিকা সহস্রাধিক কপি কিনে স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে বিক্রয় ও বিতরণ করতেন। তখন পৃথিবীতে শিশু-বালক পাঠ্য পত্রিকার চল ছিল মাত্র জার্মানির Der Kinderfreund (১৭৭৫), স্পেনের La Gaceta de Losvinos (১৭৯৮) আর ইংলন্ডের ছোটোদের পত্রিকা The Juvenile Magazine বেরিয়েছিল (১৭৮৮), তারপরেই চতুর্থ পত্রিকাটি 'দিগ্‌দর্শন'। বাংলা সাময়িক পত্রের ক্ষেত্রেও তা প্রথম। পরের মাসে ২৩ মে একই প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়েছিল বয়স্ক-পাঠ্য সাপ্তাহিক পত্র 'সমাচার দর্পণ'। ওই সময়ে বাঙালির উদ্যোগে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ও হরচন্দ্র রায়ের যৌথ পরিচালনায় প্রকাশিত হয় বাংলা সাপ্তাহিক পত্র 'বাঙ্গাল গেজেটি'।

সত্যি কথা বলতে কী যখন 'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশিত হয় তখন বাংলা গদ্য সাহিত্যের হামাগুড়ি দেবার অবস্থা। সিকি শতাব্দীও হয়নি বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রকৃত আবির্ভাব ঘটেছে। বাংলা গদ্য ভাষার সেই শৈশবেই 'দিগ্‌দর্শন' বেরুল।—অবশ্য কেবলমাত্র বাংলাতেই নয়। এটি হল বাংলা, বাংলা-ইংরেজি ও ইংরেজি অর্থাৎ তিন তিনটি সংস্করণ। প্রথম ১৬ মাসে তিন সংস্করণের পৃথক প্রকাশ হলেও ১৭ সংখ্যা থেকে এটির কেবলমাত্র বাংলা সংস্করণই প্রকাশিত হত। পরবর্তী ১০টি একক বাংলা সংস্করণ সহ মোট ২৬টি সংখ্যা বেরিয়েছিল 'দিগ্‌দর্শনের'। তার মধ্যে ১৮১৯-এর এপ্রিল থেকে ওই বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ ছিল, সম্ভবত পত্রিকার প্রধান মস্তিষ্ক উইলিয়ম কেরির পুত্র ফেরিক্স কেরির শারীরিক অসুস্থতার কারণে। তাঁরই সাময়িক অনুপস্থিতি ও অকাল বিয়োগে পরবর্তীকালে পত্রিকার প্রকাশে যবনিকাপাত ঘটে।

বিগত দুশো বছরে তিনশোরও বেশি ছোটোদের পত্রিকা এপার ওপার বাংলায় বেরিয়েছে। আমাদের এই পরিক্রমায় তার সামান্য কিছুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার চেষ্টা করব।

'দিগ্‌দর্শনের' প্রকাশ বন্ধ হবার পর ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি নিজেরা প্রকাশ করেন 'পশ্বাবলী'। কোনও একটি পশু হয় নির্দিষ্ট সংখ্যার মূল নয়, একমাত্র বিষয়ও। আরো বলা যায় 'পশ্বাবলী' হল বাংলায় প্রথম সচিত্র পত্রিকা এবং বিষয়ভিত্তিক পত্রিকাও। 'পশ্বাবলী'র সম্পাদক ছিলেন পাদ্রি জন লসন। তিনি পত্রিকার বিষয়বস্তু ইংরেজিতে লিখতেন এবং পশুর ছবিটিও এঁকে দিতেন। তিনি চিত্রশিল্পী ছিলেন—এক সময়ে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে যুক্ত থেকে ছবি ছাপা ও কাঠের ব্লক নির্মাণে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। 'পশ্বাবলী'র বিষয়বস্তু জন লসন লিখতেন আর তার বাংলা ভাষান্তর করতেন আরেক পাদ্রি ডব্লু এইচ পিয়ার্স। এই পিয়ার্স যুগ্মভাবে ভূগোল রচনা করেছিলেন ইউস্টন কেরির সঙ্গে। 'পশ্বাবলী'র প্রথমখণ্ডের বিষয় ছিল সিংহ। তার সম্পর্কে ২০ পৃষ্ঠার দীর্ঘ রচনা ছাপা হয়েছিল। শেষ চারপৃষ্ঠায় শৃগাল নিয়ে একটি লেখা ছিল, তবে সেটি সচিত্র ছিল না। পরবর্তী পাঁচটি সংখ্যার বিষয় হল যথাক্রমে ভালুক। অতঃপর হস্তী, গণ্ডার, (ও নদ্যাশ্ব = হিপোপটেমাস), ব্যাঘ্র এবং বিড়াল।

খ্রিস্টিয়ান ভার্নাকুলার এডুকেশন সোসাইটি প্রকাশ করেন 'সত্যপ্রদীপ' (১৮৬০)। সম্পাদক ছিলেন পাদ্রি স্ট্যাক। এখানে নীতিমূলক গল্পের মাধ্যমে ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্য ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হত। তাছাড়া খ্রিস্ট ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারও পত্রিকাটির লক্ষ্য ছিল। ১৮৬৬-তে কলকাতা ট্রাক্ট সোসাইটির পক্ষে ব্রজমাধব বসুর তত্ত্বাবধানে 'জ্যোতিরিঙ্গণ' নামক পত্রটিতে বিবিধ উপাখ্যান, ইতিহাস, বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা প্রকাশিত হয়। এইপত্রে প্রকাশিত রচনাগুলির ভাষা ছিল জড়তাশূন্য, বিরাম চিহ্ন ও পূর্ণযতির যথার্থ ব্যবহার।

খ্রিস্টিয় প্রতিষ্ঠানগুলির মতো এদেশি 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ'-এর পক্ষে কেশবচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় প্রথমে পাক্ষিক রূপে 'বালকবন্ধু' প্রকাশিত হয়। এতে ছোটোগল্প, কবিতা ছাড়াও সংবাদ প্রকাশিত হত। বালক-বালিকাদের সাহিত্য রচনায় আগ্রহ সৃষ্টিতে, তাদের রচনা মুদ্রণের জন্য পৃথক বিভাগ ছিল। এই প্রথা বর্তমানেও অনেক প্রধান শিশু ও কিশোর পাঠ্য সাময়িক পত্রের নিয়মিত বিভাগ। 'বালকবন্ধু'তে গণিত, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দানও করা হত। এটি পরে মাসিক রূপে প্রকাশিত হতে থাকে। পরে তার প্রকাশ বন্ধও হয়ে যায়। ফের পাক্ষিক রূপে পুনরাবির্ভাব, শেষে ফের মাসিকে রূপান্তরিত হওয়া এবং অবশেষে প্রকাশ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়া। 'বালক বন্ধু'-র চলার পথের সেটাই ছোট্ট ইতিহাস।

'বালক' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৫-তে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বালকদের মধ্যে সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা দানের জন্য। সম্পাদিকা ছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। আর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন কর্মাধ্যক্ষ। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকা উপলক্ষ্যে ছোটোদের সাহিত্যে, কিছুকালের জন্য হলেও গভীর ভাবে মনোনিবেশ করেছেন। ছোটোদের জন্য লেখার একটি সামগ্রিক ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয়েছিল। 'বালকে' রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদের স্ত্রী নরেন্দ্রবালা দেবী প্রথম বাঙালি লেখিকা হিসাবে বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা পরিবেশন করেছিলেন। 'বালক' নিজস্ব চরিত্রে একবছর ছিল। পরে ভারতী পত্রিকার অঙ্গীভূত হয়ে চারবছর কাটিয়েছিল। অতঃপর 'বালক' বন্ধ হয়ে যায়। ঊনবিংশ

শতকে ছোটোদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকার ঢল নেমেছিল। সেই তালিকায় সেরা পত্রিকাটির নাম 'মুকুল' (১৮৯৫)। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বিশিষ্ট নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী পাঁচটি ব্রাহ্মকন্যার আগ্রহে 'মুকুল' প্রকাশ করেন। এর প্রায় দশ বছর আগে তাঁরই প্রিয় ছাত্র প্রমদাচরণ সেনের অকাল মৃত্যুতে তাঁর পত্রিকা 'সখা'র হাল ধরতে বাধ্য হয়েছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। দুই বছর তাঁকে সে কাজে রত থাকতে হয়। তাই ছোটোদের পত্রিকা চালনার কাজে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই সাহায্য করেছিল, তবে 'মুকুল' তাঁর সম্পাদনায় 'সন্দেশ-পূর্ব' ছোটোদের পত্রিকার জগতে নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। অবশ্য শিবনাথের সম্পাদনাকাল ছিল ছয় বছর। অতঃপর 'মুকুল' তার পূর্ব জৌলুষ ক্রমশ হারিয়ে ফেলে। প্রথম দিকের 'মুকুল'-এর লেখক তালিকায় সম্পাদক ছাড়াও যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ছিলেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রমুখ। সেকালে 'মুকুল'-এর মতো দীর্ঘজীবী ছোটোদের আর কোনো পত্রিকা ছিল না। 'সন্দেশ' প্রকাশিত হবার পরেও 'মুকুল' বেশ কয়েকবছর প্রকাশিত হয়েছে।

এতক্ষণ উনিশ শতকের যে পত্রিকাগুলির কথা উল্লেখ করলাম তার সব কটি প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে—'বালক'-এর ঠাকুরবাড়ি একটি প্রতিষ্ঠান। এবারে বলি ওই সময়কালে ১৮৮৩-এর জানুয়ারি থেকে এক স্বপ্নদর্শী, আদর্শবাদী, বিত্তহীন নিষ্ঠাবান যুবকের অভিনব প্রয়াসের কথা। প্রমদাচরণ সেন ছিলেন সিটি স্কুলের নিম্ন বেতনের এক শিক্ষক। তিনি ছোটোদের জন্য এক অভিনব পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। সাহায্যের অলীক প্রতিশ্রুতি প্রয়োজনের মুহূর্তে হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মানুষটি একক প্রচেষ্টায় ১৮৮৩-র জানুয়ারি থেকে 'সখা' নামের মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশ করলেন। প্রচ্ছদচিত্র থেকে সকল রচনা ও ছবি তাঁরই কৃত; তার মধ্যে বাংলায় ছোটোদের জন্য লেখা প্রথম মৌলিক উপন্যাসের প্রথম কিস্তিও। তাঁর প্রয়াস সকলের তারিফ পেলেও, ছোটোদের মনোজয়ও করলেও আর্থিক ও কায়িক সহায়তা না পাওয়ায় তিনি আতান্তরে পড়লেন। এই পত্রিকায় দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে উপেন্দ্রকিশোর লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন—অবশ্যই সম্পাদকের ইচ্ছায় ও প্রেরণায়। পরের সংখ্যায় তিনি সম্পাদকের সঙ্গে যুগ্মভাবে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। বাংলা ছোটোদের পত্রিকার একটি আদর্শ আদল তৈরি করে দিতে পেরেছিলেন প্রমদাচরণ তাঁর আড়াই বছর কাল 'সখা' সম্পাদনার মধ্য দিয়ে। প্রমদাচরণের অকাল প্রয়াণের পর শিবনাথ শাস্ত্রী দুই বছর সেই দায়িত্ব বহন করেন। পরে অন্নদাচরণ সেন ও নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য পর্যায়ক্রমে পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন। তাঁদের সম্পাদনা কালে 'মাতৃভক্তি' (১১শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা) নামে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একটি রচনা প্রকাশিত হয়। অবশ্য তার দুই বছর আগেই বিদ্যাসাগরের জীবনাবসান হয়েছে। দ্বাদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা (চৈত্র ১৩০০) প্রকাশের পর বৈশাখ ১৩০১ থেকে 'সাথী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'সখা ও সাথী' মাসে মাসে প্রকাশিত হতে থাকে। 'সাথী' সম্পাদক ভুবনমোহন রায় ছিলেন প্রমদাচরণের স্বদেশবাসী ও 'সখা'-র লেখকও। তিনি 'সাথী' নামে সমধর্মী একখানি পত্রিকার সূত্রপাত করেছিলেন—তাঁর সম্পাদনার আদর্শ ছিলেন প্রমদাচরণ। একবছর 'সাথী' প্রকাশ করার পর ক্রম-ক্ষীয়মান 'সখা'-কে শিরোভূষণ করে তিনি 'সখা ও সাথী' প্রকাশ শুরু করেন। 'সাথী' প্রকাশ কালে তিনি উপেন্দ্রকিশোর রচিত একমাত্র নাটিকা 'বেচারাম কেনারাম' সচিত্র আকারে প্রকাশ করেন। আর 'সখা ও সাথী'তে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনী প্রকাশ (শ্রাবণ ১৩৩২) করেন, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স সবেমাত্র ৩৪ বৎসর। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ এই পত্রিকায় লিখতেন। সম্পাদক নিজে 'সুন্দরবনে সাত বছর' নামে একটি অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি ধারাবাহিকভাবে লিখতে শুরু করেন, কিন্তু শেষ করতে পারেননি। পঞ্চাশ বছরেরও পরে পত্রিকার এই অংশটির সঙ্গে নতুন কাহিনি জুড়ে কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এটি শেষ করেন—পরে তা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

উনিশ শতকের শেষভাগে এই দুটি পত্রিকা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয়েও আপন বৈশিষ্ট্যে ইতিহাসের সরণিতে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। আর বিশ শতকে ছোটোদের পত্রিকার জগতে সবচেয়ে বড়ো চমক হল ১৯১৩-য় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সম্পাদিত 'সন্দেশ'-এর প্রকাশ। এমন সুনির্বাচিত রচনা, পরিপাটি মুদ্রণ, আশ্চর্য অঙ্গসজ্জা, রঙিন ও সাদা কালো ছবির প্রাচুর্য বাংলা ছোটোদের পত্রিকা কোনোদিন পায়নি। তিন দশক আগে 'সখা'য় তাঁর সাহিত্য রচনায় হাতে খড়ি, তারপর নিয়মিত চর্চা করেছেন, মুদ্রণ সৌন্দর্য নিয়ে গবেষণা করেছেন, ইলাসট্রেটর হিসাবে নিজেকে সার্থক প্রমাণিত করেছেন; ইউ রায় অ্যান্ড সন্‌স্ প্রকাশিত গ্রন্থগুলিতে তাঁর যত্নের ছোঁওয়া পাওয়া যায়। 'সন্দেশ' শিশু সাহিত্য পত্রিকার ইতিহাসে এক স্থান-চিহ্ন। উপেন্দ্রকিশোর দু'বছর ন'মাস 'সন্দেশ' প্রকাশ করে চোখ বুজলেন, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সুকুমার রায় যোগ্য হাতে তাকে পরিচালনা করলেন, পত্রিকার চরিত্র বদল করে শিশুপাঠ্য 'সন্দেশ'কে কিশোর পাঠ্য করে তুললেন। আট বছর সম্পাদনার পর সুকুমারের অকাল প্রয়াণে ব্যবসায়িক সুস্থিতি নষ্ট হল এবং আরও দুবছর পর 'সন্দেশ'-এর প্রকাশ বন্ধ হল। পাঁচ বছর পরে দ্বিতীয় পর্বে 'সন্দেশ' প্রায় চারবছর বেরিয়েছিল। তার পঁচিশ বছর পরে তৃতীয় পর্বের 'সন্দেশ' বেরুবে, সেকথা পরে।

কিন্তু ১৯২০ সালে বেরুল একালের সবচেয়ে সাড়া জাগানো কিশোর মাসিক 'মৌচাক'। সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকার তাঁর সঙ্গে নিলেন 'ভারতী' পত্রিকার লেখক গোষ্ঠীকে। ক্রমে 'কল্লোল', 'বিচিত্রা' গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠীহীন লেখকদের জড়ো করলেন একছাতার তলায়। তাছাড়া যাঁরা ছোটোদের জন্য লেখেন, তাঁরা তো রইলেনই। এর লেখক তালিকায় চোখ রাখলে চমকে উঠতে হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, মনীন্দ্রলাল বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নজরুল ইসলাম, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, শিবরাম

চক্রবর্তী। আরো কত লেখক! এই পত্রিকাটি নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে বর্তমানে শতবর্ষের দোরগোড়ায় হাজির হয়েছে। বাংলার পত্র পত্রিকার ইতিহাসে এটি স্মরণযোগ্য ঘটনা।

'মৌচাক' প্রকাশের দুবছরের মধ্যে (১৯৯২) 'শিশুসাথী' বেরুল। 'শিশুসাথী'র প্রকাশ শুধু কলকাতা থেকে নয়, একই সঙ্গে ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকেও। এ পত্রিকায় একটি অন্যস্বাদের গ্রামীন শ্যামলিমা যেন ছড়িয়ে ছিল তার রচনায়, তার সাজসজ্জায়। পরিচয়টা শহুরে না হলেও তার আন্তরিকতা মনকে ছুঁয়ে যেত। এ পত্রিকার লেখক তালিকায় ছিলেন কালিদাস রায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, মনোরম গুহঠাকুরতা, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, আশাপূর্ণা দেবী, মনীন্দ্র দত্ত, ধীরেন্দ্রলাল ধর প্রমুখ।

'শিশুসাথী'-র এক বছর পরে (১৯২৩) প্রকাশিত হয় নিশিকান্ত সেনের 'খোকাখুকু'। 'খোকাখুকু'-র উদ্দিষ্ট পাঠকশ্রেণী গ্রাম-বাংলার বালক ও কিশোরেরা। এই পত্রিকার এক সাহিত্য প্রতিযোগিতায় সদ্য-কিশোরী আশাপূর্ণা দেবী 'স্নেহ' শীর্ষক কবিতা লিখে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। পুরস্কারের সঙ্গে পেয়েছিলেন সম্পাদকের একখানি চিঠি। তাতে লেখা, —তোমার লেখাটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। মা, আমাদের দেশে মেয়েদের জীবনের পথে অনেক বাধা। তুমি সাধ্যমতো এ চর্চা ছেড়ো না। তোমার মধ্যে অনেক সম্ভাবনা আছে।' এমন সম্পাদকের মরমী মনোভাব ও দূরদৃষ্টির প্রশংসা করতেই হয়। এমন সম্পাদক কি এখনও পাওয়া যায়? এই পত্রিকায় অনেক বিশিষ্ট লেখকেরা লিখতেন। বিমল ঘোষ (মৌমাছি)-র হাতেখড়ি হয়েছিল এই পত্রিকায় লিখে। ১৯২৪-এ ঢাকা থেকে প্রকাশিত হল 'রাজভোগ'। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বিদ্যালয়ের ছাত্র সুধাংশুভূষণ গুপ্ত। অবশ্য পৃষ্ঠপোষণা ছিল বিশিষ্ট সাহিত্যিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের। ঢাকার তরুণ বয়সী লেখক বুদ্ধদেব বসু 'রাজভোগে'র চারসংখ্যায় লিখেছিলেন। বিখ্যাতদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং অবশ্যই যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ১৯২৭ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হল ভিন্ন জাতের এক মাসিক পত্র। নাম 'বেণু'। সম্পাদক বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়। যিনি ছিলেন বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের অগ্রণী কর্মী। এই পত্রিকায় লিখেছেন অবনীন্দ্রনাথ। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বিপ্রদাসের' মতো উপন্যাসও লিখেছেন। এই পত্রিকায় রাজনীতি বিষয়ক লেখা প্রকাশিত হত।

১৯২৮-এ ছোটোদের প্রিয় পত্রিকা 'রামধনু' প্রকাশিত হল। প্রকাশের পর দুবছর পিতা বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য সম্পাদনার দায়িত্ব জ্যেষ্ঠ পুত্র অধ্যাপক সাহিত্যিক মনোরঞ্জনের হাতে তুলে দেন। তিনি জাপানি গোয়েন্দা হুকাকাশির গল্প আর মজার গল্প লিখে আসর মাত করেছেন। তিনি মাত্র আট বছর সম্পাদনার পর অকালে প্রয়াত হন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। প্রায় ছয় দশক এই পত্রিকাটি চালু ছিল। বাংলার প্রধান সব লেখকই এতে লিখেছেন। শিবরাম চক্রবর্তীর 'বাড়ি যেতে পালিয়ে' বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পিঁপড়ে পুরাণের' মতো বাংলা শিশু সাহিত্যের সম্পদ এখানেই প্রথম বেরিয়েছিল।

ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও অখিল নিয়োগীর যুগ্ম সম্পাদনায় ১৯২৯-এ প্রকাশিত হয়েছিল 'মাস পয়লা।' পত্রিকাটি স্বল্পজীবী হলেও অনেক মূল্যবান রচনা প্রকাশ করেছে। বারোজন বিখ্যাত লেখককে দিয়ে বারো মাসে বারো কিস্তি লিখিয়ে ছোটোদের প্রথম বারোয়ারি উপন্যাস 'অজানার উজানে' লিখিয়েছিলেন।

নরেন্দ্র দেব বাংলার বিশিষ্ট কবি ও বরিষ্ঠ সাহিত্যিক। তাঁর সম্পাদনায় ১৯৩৬-এ প্রকাশিত হয় 'পাঠশালা'। তার শ্লোগান ছিল :

আমাদের এই পাঠশালাতে
পড়লে কেবল ছুটির পড়া।
পাঠশালার এই আটচালাতে
চলবে দেশের মানুষ গড়া।

নরেন্দ্র দেবের টানে, অথবা 'পাঠশালা'র পাঠ দিয়ে অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ওখানে লিখেছেন। সেদলে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এস ওয়াজেদ আলি, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সহ অনেক খ্যাতিমান লেখকের লেখা 'পাঠশালা'য় নিয়মিত বেরিয়েছে।

তবে সেকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে কিশোর মাসিকটি ১৯৩৭-এ বেরিয়েছিল তার নাম 'রংমশাল'। এর বৈচিত্র্য সবখানে। প্রথম সম্পাদক ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। অতঃপর হেমেন্দ্রকুমার রায়। তিনি সে দায়িত্বভার ছেড়ে চলে গিয়েও ফেরত এসেছিলেন—মাঝে সে দায়িত্ব সামলে ছিলেন সতীকান্ত গুহ। সতীকান্তও ছোটোদের বড়ো লেখক ছিলেন। অল্প লিখলেও তা কিশোরদের পক্ষে উপাদেয় ছিল। হেমেন্দ্রকুমার দ্বিতীয়বার দায়িত্ব ছাড়লে এবারে দায়িত্ব নেন কামাক্ষীপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-ভ্রাতৃদ্বয়। তবে একটি কথা বলা দরকার, অন্তরালে থেকে পত্রিকা পরিচালনা করতেন আশুতোষ কলেজের উপাধ্যক্ষ খগেন্দ্রনাথ সেন। 'রংমশাল'-এর প্রকাশকাল ছিল বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের মহা আলোড়নের কাল। স্বাধীনতার লড়াই, বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, স্বাধীনতা লাভ, দেশভাগ, দেশত্যাগী উদ্বাস্তুদের জনস্রোত বাংলার সমাজ জীবনকে থিতু হয়ে দেয় নি। তার ভেতরেই সম্পাদকেরা সেরা রচনায় 'রংমশাল'-এর পাতা ভরিয়েছেন (সেকালের ছোটোদের অন্য পত্রিকার তুলনায় 'রংমশাল'-এর আকার ছিল বড়ো)। 'রংমশালে' শুধু গল্প-উপন্যাসের ছড়াছড়িই ছিল না, সঙ্গে ছিল নানা বিভাগীয় রচনা—ছোটোদের জন্য আকর্ষণীয় কত যে বিভাগ ছিল!

স্বাধীনতার দিন (১৫ আগস্ট, ১৯৫৭) 'কিশোর এশিয়া' নামে ছোটোদের একটি পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়। সুনির্মল বসু তার পরিচালক ছিলেন। স্বাধীনতার বছরে (ফাল্গুন, ১৩৫৪) দেব সাহিত্য কুটির থেকে শুকতারা নামে একখানি ছোটোদের মাসিক পত্রের প্রকাশ শুরু হয়। এটি ৭১ বছরের রমরমিয়ে চলছে। এই রকমই 'শিশুমেলা' ১৯৬১, 'সন্দেশ' (তৃতীয় পর্যায়) ১৯৬১, 'কিশোর

ভারতী' ১৯৬৮, 'তেপান্তর' ১৯৭৩, 'আনন্দমেলা' ১৯৭৫, 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান' ১৯৮০, 'চাঁদের হাসি' ২০০৫ ইত্যাদি পত্রিকাগুলি এখনও কম বেশি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এদের মধ্যে শুধু 'সন্দেশ' সম্পর্কে বলা যায় এর তৃতীয় পর্যায়ের প্রকাশ হয়েছিল রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে। প্রথম প্রকাশ যে বছরে হয়েছিল, সে বছরেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। আর 'সন্দেশ'-এর পাতাতেই ঝরেছিল উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার ও সত্যজিতের ঝরনার মতো রচনা প্রবাহ।

স্বাধীনতার পরে প্রকাশিত, সাড়া জাগানো কিন্তু যাদের জীবন দীপ নির্বাপিত, তেমনি কয়েকটি পত্রিকার বিষয় সামান্য উল্লেখ করি।

'আগামী'-র (১৯৫২) সম্পাদক ছিলেন প্রসূন বসু। সমাজের নিপীড়িত শোষিত মানুষের কথা বলার জন্যই এ পত্রিকার আবির্ভাব। অবশ্য ক্রমে সে চরিত্র বদলে অনেকখানি সাধারণ কিশোর পত্রিকার চরিত্রে ফিরেছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ের 'আগামী'-তে অনেক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যাচ্ছিল—যার প্রকাশ অচিরে বন্ধ হয়। শৈলেন ঘোষ ও দিলীপ দে চৌধুরীর যুগ্ম সম্পাদনায় ছোটোদের জন্য 'রবিবার' নামে ডিমাই আকারের ষোলো পৃষ্ঠার রঙিন এক আশ্চর্য সাপ্তাহিক পত্রিকা বেরিয়েছিল। প্রতি সপ্তাহেই বেরুত। সরস্বতী পুজোর দিনে বেরুল 'হাতে খড়ি' সংখ্যা। পুজো সংখ্যাও বেরিয়েছিল একটি। এমন নজর কাড়া পত্রিকা আভ্যন্তরীণ ভুল বোঝাবুঝির ফলে একবছরে বন্ধ হয়ে যায়।

'রোশনাই' বেরিয়েছিল ১৯৬০-এ রমেন দাসের সম্পাদনায়। তাতে বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিকদের অনেকেই লিখেছিলেন। তবে প্রথম পর্যায়ে পত্রিকা দুবছরেই বন্ধ হয়। দুবছর বন্ধ থাকার পরে ১৯৬৪-তে গীতা দাশের (পরে দত্ত) সম্পাদনায় 'রোশনাই'য়ের পুনরার্বিভাব হয়। এবং ১৯৭৮ পর্যন্ত চলেছিল তার সঙ্গী ক্ষুদে পাঠকদের পাক্ষিকপত্র 'ঝুমঝুমি'কে সঙ্গে নিয়ে। 'ঝুমঝুমি' বেরিয়েছিল ১৯৭০-এ দোলের দিনে। ছোটোদের কাছে জনপ্রিয়ও হয়েছিল। ১৯৭৮-এ 'রোশনাই-ঝুমঝুমি' হঠাৎই বন্ধ হয়ে যায়।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ছোটোদের এক অবিস্মরণীয় পত্রিকার প্রথম সম্পাদক হয়ে স্মরণীয় হয়েছিলেন। যৌবনের সকল উদ্যম দিয়ে 'রংমশাল'-এর প্রতিটি পাতার পরিকল্পনা করতেন। প্রায় পঁচাত্তর বছরে পৌঁছেও (১৯৭৮) কিন্তু তাঁর উদ্যম কমেনি—'পক্ষিরাজ'-এ চড়িয়ে বাংলার কিশোর পাঠকদের মনে পত্রিকা পাঠের সুখ এনে দিয়েছিলেন। তাঁর সযত্ন সম্পাদনা 'পক্ষিরাজ'-কে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছিল। ইত্যাদি প্রকাশনী থেকে বেরিয়েছিল 'কিশোর মন'। পত্রিকা জগতে দীর্ঘদিনটিকে থাকবার সামর্থ নিয়ে এসেছিল এবং তার প্রমাণও রাখছিল; কিন্তু হঠাৎই একটা বড়ো পত্রিকা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান বিনা নোটিশে বন্ধ হয়ে গেল।

'সকাল' নামে ট্যাবলয়েড আকারের একটি কিশোরদের উপযোগী সাপ্তাহিক পত্রিকা বেরিয়েছিল মূলত পূর্ণেন্দু পত্রীর পরিকল্পনায়। সংবাদ ভিত্তিক, নানা তথ্যভরা নিবন্ধ থাকত। যাতে পাঠের মজাটাই ছিল আলাদা। তাছাড়া ছিল একটা করে পূজাবার্ষিকী। একেবারে স্বতন্ত্র স্বাদের। শুধু লেখায় নয়, রেখার টানেও। বড়ো দুঃখ হয় এমন স্বপ্নের পত্রিকা চার বছরের বেশিটিকে থাকতে পারে নি।

ওপার বাংলার কিছু শিশু-কিশোর সাময়িক পত্রের খোঁজ খবর দিই এবারে। দেশ ভাগের আগেই ঢাকা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, রংপুর, যশোর, বরিশাল প্রভৃতি স্থান থেকে ছোটোদের পত্রিকা প্রকাশের তথ্য আমাদের কাছে আছে। ইতিপূর্বে সে তালিকাও অন্য সংখ্যায় প্রকাশ করেছি। এবারে দেশ বিভাগোত্তর পূর্ব পাকিস্তান বা স্বাধীন বাংলাদেশের ছোটোদের পত্রিকার যতটুকু তথ্য আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি তা এই প্রতিবেদনে যুক্ত করার চেষ্টা করছি।

দেশভাগ বা পাকিস্তান গঠনের (আগস্ট ১৯৪৭) অব্যবহিত পরে ১৯৪৮-এর ডিসেম্বরে, মুকুল ফৌজ নামক ছোটোদের প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় দফতর প্রকাশিত 'মুকুল' নামক পাক্ষিক পত্রিকাটি ছিল ওপার বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানে প্রকাশিত ছোটোদের প্রথম পত্রিকা। পাক্ষিকের উদ্দেশ্য ছিল—স্বার্থকে দূরে সরিয়ে পরার্থকে বড়ো করে দেখা যেন কিশোরদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়, মানুষের কল্যাণ যেন কিশোরদের মনে ধর্মীয় আদর্শের দানা বাঁধে। মুকুলের মাত্র দশটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তবে ছোটোদের পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয় না। বিশিষ্ট গবেষক ও অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ জানিয়েছেন ১৯৪৭-১৯৭০ সময়কালে ও দেশে ছোটোদের জন্য প্রকাশিত পত্র পত্রিকা ও সাময়িকীর সংখ্যা ৩৩। তাদের মধ্যে উদ্ভাবনা বৈচিত্র্য বা লেখার গুণ, প্রকাশনা, পারিপাঠ্য—কোনো বা কোনো কারণে বিশিষ্ট হয়ে আছে এ কটি 'ঝংকার' (১৯৪৯), 'হুল্লোড়' (১৯৫০), 'আলাপনী' (১৯৫৪), 'সেতারা', 'শাহীন', 'খেলাঘর' (১৯৫৫), 'মধুমালা' (১৯৬০), 'সবুজ পাতা' (১৯৬২), 'টরে টক্কা', 'কচি ও কাঁচা' (১৯৬৪), 'টাপুর টুপুর' (১৯৬৫) এবং 'নবারুণ' (১৯৭০)। এবারে এগুলি নিয়ে একটু বিশদে বলা যাক—'ঝংকার' পত্রিকা ছিল সাহিত্যগুণ সম্পন্ন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম কিশোর মাসিক পত্র। যদিও মাত্র দশটি সংখ্যা বেরিয়েছিল কিন্তু উদ্যম ছিল প্রশংসনীয়। মঈদ উর রহমান পত্রিকাটির সম্পাদক হলেও মূল চালিকা শক্তি ছিলেন মীজানুর রহমান। মীজানুর ছিলেন সাবেক কলকাতা শহরের মানুষ। অ্যান্টনীবাগান এলাকায় থাকতেন। পড়তেন মিত্র (মেন) স্কুলে, মির্জাপুরে। 'ঝংকারে'র প্রথম সংখ্যায় লেখা হয়েছিল পূর্ববঙ্গের নিজস্ব কিশোর পত্রিকা নাই। সুতরাং ঝংকারের আত্মপ্রকাশ অনাহুত নয়। ঝংকারের পাতা কিশোর কিশোরীদের কাঁচা হাতের লেখা নিয়েই পূর্ণ থাকবে বেশি।' পরের বছর ফয়েজ আহমদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'হুল্লোড়'। আনোয়ার রহমান জানিয়েছেন, 'রচনার স্বাদুতায়,' সম্পাদনার নিপুণতায় এবং অঙ্গের সৌষ্ঠবে 'হুল্লোড়' ছিল ষষ্ঠ দশকের সর্বশ্রেষ্ঠ শিশুপত্রিকা। আলাপনী বেরিয়েছিল ১৯৫৪-এর আগস্টে। সেটি ছিল সচিত্র কিশোর মাসিক। আট বছর এটি চালু ছিল এবং পাঠক মহলে বেশ প্রিয় ছিল। ১৯৫৫-য় তিনটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তার দুটি পাক্ষিক এবং একটি মাসিক। 'সেতারা' ছিল শিশুদের জন্য পাক্ষিক পত্রিকা। বলা যায় শিশুদের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম পাক্ষিক পত্র হল 'সেতারা'। 'শাহীন' ছিল কিশোরদের উপযোগী পাক্ষিক পত্রিকা। এই দুটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কথাশিল্পী সরদার জয়েনউদ্দীন। বেগম দেব-উন-নিমা আহমদ-এর সম্পাদনায়

প্রকাশিত 'খেলাঘর' ছিল কিশোর কিশোরীদের সচিত্র মাসিক পত্র। এই পত্রিকাটি সেকালের হিসাবে সবচেয়ে দীর্ঘজীবী ছিল।

'টরেটক্কা' ছিল ছোটোদের মাসিক বিজ্ঞান পত্রিকা—ওয়েস্ট এন্ড হাইস্কুলের অগ্রণী বিজ্ঞান সংঘের মুখপাত্র। কিশোর বয়সী ছেলেদের উদ্যোগে প্রকাশিত এই পত্রিকার মান ছিল বিস্ময়কর রূপে উন্নত। শামসুল হক এই পত্রিকা সম্পর্কে তাঁর 'বাংলা সাময়িক পত্র (১৯৪৭-৭১) গ্রন্থে লিখেছেন, 'এ পত্রিকা স্কুলের ছাত্রদের। সুতরাং এর ঐশ্বর্যশালী হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বিষয়, ভাষা, রচনাশৈলী ইত্যাদিতে 'টরেটক্কা' ছিল সত্যিই ছোটোদের উপযোগী এবং সত্যিকার শিশুভোগ্য পত্রিকা। তখনকার ওই স্কুলের ছাত্র ভুঁইয়া ইকবাল ছিলেন এই পত্রিকার মূল সূত্রধর। পরে তিনি বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং বিজ্ঞান লেখক হিসাবে পরিচিতি পান।

কেন্দ্রীয় কচিকাঁচা মেলার মুখপত্র ছিল 'কচি' ও 'কাঁচা'। তার সম্পাদক রোকনুজ্জামান খান ছিলেন সাংবাদিক ও সংগঠক। তিনি অনেক গুণিজনকে 'কচি ও কাঁচা'র সঙ্গে যুক্ত করার ফলে পত্রিকার লেখক তালিকায় তাঁদের হাজির করতে পেরেছিলেন।

কিশোর মাসিক 'টাপুর টুপুর' প্রকাশিত হয় এখলাসউদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় (১৯৬৬)। সম্পাদকের প্রণোদনায় বহু খ্যাতনামা বয়স্ক-পাঠ্য-সাহিত্য রচয়িতা ছোটোদের জন্য কলম ধরেছেন ও শিশু সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। 'নবারুণ' অবশ্য প্রাতিষ্ঠানিক সরকারি পত্রিকা। তার আয়ু সুদীর্ঘ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার চরিত্রে কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়নি।

বাংলাদেশ পর্বের কয়েকটি পত্রিকার কথা বলে আমাদের সাহিত্যপত্রের দীর্ঘযাত্রা পথের পালা গান বন্ধ করব। স্বাধীনতার পর ত্রিশ বছরে বাংলাদেশে, শুধু ঢাকা নয়, চট্টগ্রাম, রাজসাহী, খুলনা, সিলেট মিলিয়ে কুড়িটির বেশি ছোটোদের পত্রিকা বেরিয়েছে। তার কয়েকটি হল, 'ধান শালিকের দেশ'—বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত। 'শিশু'—শিশু একাডেমির মুখপত্র। ইসলামিক ফাউণ্ড পত্রের 'সবুজ পাতা'। সেলিনা সবিহ্ সম্পাদিত 'টইটম্বুর' নামের মাসিক শিশু পত্রিকা ঢাকা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। চট্টগ্রাম থেকে আবুল মোমেনের সম্পাদনায় 'লেখাপড়া' প্রকাশিত হয় শিশুদের মনের খোরাক নিয়ে। মোমেন সাহেব এর আগে 'ফুলকি' সাময়িকী বের করেছিলেন—তাতে শিশু ও কিশোরদের জন্য লেখা থাকত। লেখক তালিকায় ছিলেন দুই বাংলার লেখকেরা। 'পুটুস' নামে শিশু কিশোরদের পত্রিকা বেগম সফুরা হোসেনের সম্পাদনায় বেরিয়েছিল ১৯৮৯-এ। কাজী আনোয়ার হোসেন সম্পাদিত 'কিশোর পত্রিকা' উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

এবারে আমরা ঝালাপালা-২০১৮-এর কথা বলি। ইতিপূর্বে ১৯৯৩, ১৯৯৪, ১৯৯৫-তে আমরা ছোটোদের সাময়িক পত্রের ১৭৫ বছর উপলক্ষ্যে ১৮১৮-১৯৯৩ পর্বে ছোটোদের জন্য প্রকাশিত অজস্র পত্রিকা থেকে তিন বছরে প্রায় ২০০ গল্প উদ্ধার করে প্রকাশ করেছিলাম। সেই সংগ্রহে বাংলা শিশু সাহিত্যের আদিপর্ব থেকে দীর্ঘ যাত্রাপথের ধারাবাহিক পট ও পথ পরিবর্তন ও বিবর্তনের পরিচয় ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলাম। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সেসময় বাংলাদেশ পর্ব কিছুকেই সংগ্রহ করতে পারি নি। এবারেও সেই প্রয়াসে আংশিক ফল পেয়েছি। আমাদের এদেশের ১৯৯৪-২০১৭ পর্বের লেখা এবং বাংলাদেশের প্রকাশ যোগ্য যত লেখা সংগ্রহ করতে পেরেছি তা দিয়েই হচ্ছে এবারের 'ঝালাপালা' গল্পবার্ষিকী-র পক্ষে বাংলা সাময়িক পত্রের দ্বিশত বার্ষিকী উদযাপন। এই সংকলনের গল্প সংগ্রহ করতে এপার এবং ওপার বাংলার অসংখ্য বন্ধুর সাহায্য আমরা পেয়েছি। তাঁদের প্রতি আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই।

এখন আকাশ নির্মেঘ নীল, কাশবনে ফড়িং-এর ওড়াউড়ি। শিউলি তলায় ঝরে পড়েছে শিউলির স্তূপ। বাতাসে ছুটির ঘণ্টা। বাংলার ছোটোদের হাতে তুলে দিলাম দুই বাংলার প্রিয় গল্পের সংকলন—নানা স্বাদের, নানা ভাবনার, নানা রঙের, নানা পছন্দের। অন্য উপাচারের সঙ্গে এই গল্প সম্ভার তাদের শারদ অবকাশ আনন্দে ভরে উঠুক এই কামনা।

ঝালা
পালা

মহালয়া, ১৪২৫

সূচিপত্র

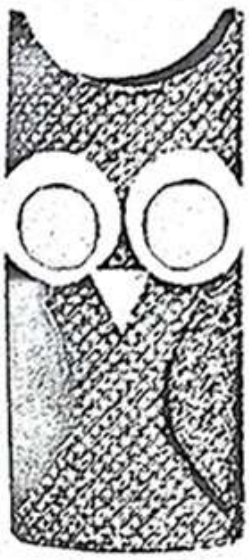

অতলজলের আহ্বান	জাহিরুল হাসান	৯
নামাবলি	দীপঙ্কর বিশ্বাস	১৪
আকাশে মৃত্যুর ফাঁদ	স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮
শুভ্রতনু	শুভমানস ঘোষ	২৪
মহীয়সী রানি ভবানী	দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৬
বাদামতলির মাসি	সলিল চট্টোপাধ্যায়	৩১
অবনীবাবুর স্বপ্ন	অমর মিত্র	৩৫
দুই কবিরাজের গল্প	কুমার মিত্র	৩৯
ডাক বাংলোর রহস্য	তপন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৪
যুগলময়ূরী	ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়	৪৯
সুপারজিনিয়াস পিলপিলেদা	অপূর্ব দত্ত	৫৯
লম্বা বারান্দা	আলোক সরকার	৬৪
চিরুনি	শোভন শেঠ	৬৭
নীল পাহাড়ের গান	সনৎ বসু	৭০
বুচকানের পৃথিবী	দীপ মুখোপাধ্যায়	৭৩
আগুন লাফ	প্রচেত গুপ্ত	৭৭
আনন্দভবনের ঘণ্টা	অধীর বিশ্বাস	৮১
উঠোন	হেমেন্দুশেখর জানা	৮৩
ছোটকু ও কালিন্দীর গল্প	ভগীরথ মিশ্র	৮৬
দাদুয়া	দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য	৮৯
তোর সঙ্গে আড়ি	অরুণ চট্টোপাধ্যায়	৯৬
মউলির ছেলে	পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়	৯৮
ছোটো রাজার পোষ্য	সৈকত মুখোপাধ্যায়	১০২
বাড়ি থেকে পালিয়ে	প্রসাদরঞ্জন রায়	১০৭
ধূমলি গড়ের গাছের ডাক	কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়	১০৯
এক যে ছিল থেংতোন	জয়া মিত্র	১১৪
দুর্বাসার অর্জুন	গৌর বৈরাগী	১১৭
বাঘের ডেরায়	দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৩
বন্ধু	মন্দাক্রান্তা সেন	১২৭
আসল ছবি	ছন্দা চট্টোপাধ্যায়	১৩০
মুড়োহাসা গ্রামে	অমরেন্দ্র চক্রবর্তী	১৩৪
সেই জার্সিটা	দেবাশিস সেন	১৩৮
জল দেবতার নৌকা	অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী	১৪৩
অন্নজ্যেঠীর পোষা বাঘ	অনিতা অগ্নিহোত্রী	১৪৭

সাতই ফাল্গুন, বেলা এগারোটা চার	জয়দীপ চক্রবর্তী	১৫০
আসমানি	শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য	১৫৫
বিক্রম, সদাশিব ও শিবাজি	তৃষিত বর্মন	১৫৭
খিদের চেহারা	অন্বেষা বিশ্বাস	১৬১
ছত্রশালের নখ	হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত	১৬৪
মিলি	চন্দন নাথ	১৭১
ফরেন ঠাম্মা	শাশ্বতী নন্দী	১৭৫
শ্লেট ও চকখড়ির গল্প	সুনির্মল চক্রবর্তী	১৭৮
ইচ্ছে খুশির দেশ	তপন কুমার দাস	১৮১
সারপ্রাইজ	শিশির বিশ্বাস	১৮৫
লামাকাকা	রাজেশ বসু	১৮৯
সান্দাকফু	ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৯২
ক্যাপটেন হাডকের সঙ্গে কয়েকদিন	অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী	১৯৬
বাল্লার বাহাদুরী	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	২০৪

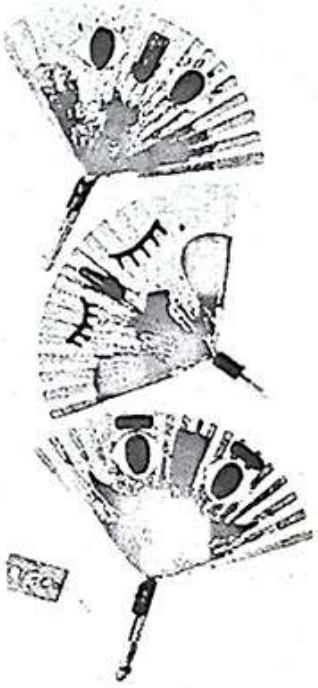

বাংলাদেশের গল্প

সুজনের কবুতর	হোসেন মীর মোশার রফ	২০৭
হঠাৎ রাজার খামখেয়ালী	এখলাস উদ্দিন আহমদ	২১০
মিতুলের দুষ্টুমি	আবুল হাসানাত	২১৩
দোয়েলের মন ভালো নেই	ইমদাদুল হক মিলন	২১৫
তিতাসের বন্ধু	লুৎফর রহমান	২১৮
আহসানদের পাতানো নানি	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	২২০
গনি মাস্টার	আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন	২২৪
ইউলিসিসের স্বদেশ যাত্রা	মোবারক হোসেন খান	২২৬
সমতার স্বপ্ন	ইসহাক খান	২৩১
স্মিতামণি ও তার স্মিত হাসি	হুমায়ুন আজাদ	২৩৩
পরান চাষির ছেলে জীবন	বিপ্রদাস বড়ুয়া	২৩৬
শানুর রাজহাঁস	শওকত আলী	২৩৮
মিশু	আনোয়ারা সৈয়দ হক	২৪০
চরু	হাসান আজিজুল হক	২৪২
বাঘের মাসি	আমীরুল ইসলাম	২৪৫
ছবির মানুষ	মাহবুব রেজা	২৪৭
ফিরে পাওয়া	জাফার তালুকদার	২৫১
সাইকেলে সঙ্গী	আনজীর লিটন	২৫৪
রাসেলের বন্ধুদের অপেক্ষা	সেলিনা হোসেন	২৫৮
নিম গাছ	আহসান হাবিব	২৬২
মা এখন জলছবি	আমজাদ হোসেন	২৬৪
কল্পকথার গল্প	মাহবুব তালুকদার	২৬৮
আমার বাঘমামাই	ধ্রুব এষ	২৭১

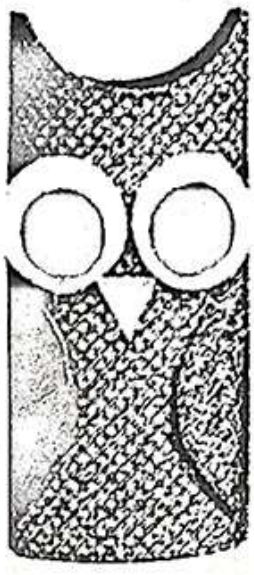

অতল জলের আহ্বান

জাহিরুল হাসান

তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। আকাশ তারায় তারায় ঝলমল করছে। কিন্তু চাঁদের আজ ছুটি। অমাবস্যা।

ডেকের উপর বসে একটা রহস্য-উপন্যাস পড়ছিল রুদ্রদীপ। টর্চের আলো জ্বেলে। ওর এখন পাহারা দেবার ডিউটি। বাকি সবাই ঘুমোচ্ছে।

শান্ত সমুদ্রে হালকা বাতাস বইছে। নৌকা চলেছে তর্ তর্ করে।

ছোটোবেলা থেকে রুদ্রদীপ জলের পোকা। গোপালপুরের সমুদ্র সৈকত ওদের বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিট। সমুদ্রের জলে দাপাদাপি করে ও বড়ো হয়েছে। কিন্তু গভীর সমুদ্রের সঙ্গে পরিচয় হল এবারের অভিযানে এসে। জেদ করে মামার সঙ্গী হয়েছে।

বারো বছরের ছেলেকে নিয়ে দূর সফরের ঝুঁকি নিতে রাজি হয়নি দলের কেউ। কথা ছিল, ও মাদ্রাজে নেমে যাবে। কিন্তু কয়েকদিন সমুদ্রে কাটিয়ে ওর এমন নেশা ধরে গেছে যে কিছুতেই ফিরে যেতে রাজি হল না। মামা এবং মামার বন্ধুদের মতো সমুদ্রের নোনা জল, এখন ওরও রক্তে সওয়ার। ও এখন পুরোদস্তুর নাবিক। টিম-লিডার বিপ্লব মহান্তি ভরসা করে ওকে এখন পাহারা দেবার দায়িত্ব দিয়েছে।

কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর বই থেকে মুখ তুলে রুদ্র নজর রাখছিল, কোনো জাহাজ-টাহাজ ঘাড়ের উপর এসে পড়ে কি না। তার সম্ভাবনা অবশ্য খুবই কম। এ তো শহরের সরু রাস্তা নয় যে একটু অমনোযোগী হলে দুর্ঘটনা ঘটবে। তবু সতর্ক থাকা দরকার। ওরা দেখেছে, কোনো কোনো জাহাজ উপযুক্ত

আলো ছাড়াই চলে। সমুদ্রের বুকে অন্ধকারে মিশে থাকে। ধাক্কা লাগলে আর রক্ষে থাকবে না।

দুটো পর্যন্ত ওর ডিউটি। তারপর মামা সৌরজিতকে দায়িত্ব দিয়ে ও নেমে যাবে কেবিনে ঘুমোতে।

টর্চের ব্যাটারি নষ্ট হচ্ছে ভেবে বই বন্ধ করে রাখল সে। নীচে গিয়ে নিয়ে এল নিজের স্প্যানিশ গিটারটা। উন্মুক্ত সলিল প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ল গিটারের মধুর ধ্বনি।

সুরের মধ্যে ডুবে ছিল রুদ্র।

হঠাৎ ঝন্ ঝন্ শব্দে ছিটকে পড়ল গিটার। ডেকের উপর গড়াগড়ি খেতে লাগল রুদ্র। নৌকোর মুখ জল ছেড়ে প্লেনের মতো টেক্ অফ্ করতে চাইল। কিন্তু পুরোপুরি উত্তীর্ণ হবার আগেই প্রচণ্ড শব্দে আছড়ে পড়ল জলের ওপর। ডান দিকে একটু কাত হয়েই বাঁ দিকে হেলে পড়ল। দুমড়ে গেল মাস্তুল।

নীচে কেবিনেও সবাই গড়াগড়ি খাচ্ছে। বাঙ্ক থেকে পড়ে গিয়ে খুব জোরে মাথা ঠুকেছে সৌরজিতের। হতভম্ব ভাবটা কাটতেই বুঝতে পারল মাথাটা ফেটে গেছে।

কেবিন থেকে প্রথম বেরিয়ে এল সার্ফ এ্যান্ড স্যান্ড হোটেলের একুশ বছরের স্টুয়ার্ড অবকাশ জেনা। বালি অভিযানের দ্বিতীয় কনিষ্ঠ সদস্য।

অবকাশ উপরে উঠে দেখল, ডেক খালি। রুদ্র নেই। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে সে টর্চ আনতে ছুটল।

সৌরজিত তখন মাথায় একটা গামছা বাঁধার চেষ্টা করছে।

বিপ্লব তার বন্ধু ইদ্রিস আলির শুশ্রূষায় ব্যস্ত, অকস্মাৎ আঘাতে জ্ঞান হারিয়েছে ইদ্রিস।

অবকাশকে দেখে বিপ্লব ব্যগ্রভাবে জানতে চাইল,—কীসে ধাক্কা লাগল?

—জানি না। সর্বনাশ হয়েছে। রুদ্রকে দেখতে পাচ্ছি না।

শুনে সৌরজিত লাফিয়ে ডেকের দিকে ছুটল। অবকাশ টর্চ নিয়ে ওর পিছন পিছন।

স্টার সাইড—অর্থাৎ নৌকোর বাঁ দিকে আলো ফেলা হল। কোথাও রুদ্রর কোন চিহ্ন নেই। গেল কোথায় ছেলেটা?

নিজেদের সামগ্রিক বিপদের কথা ভুলে ভাগ্নের জন্য উদ্বেগে ছট্‌ফট্ করতে লাগল সৌরজিত।

খুঁজতে খুঁজতে অবকাশ পোর্টসাইড—অর্থাৎ নৌকোর ডান দিকে গেল। জলে আলো ফেলতেই সে যে দৃশ্য দেখল, তা এতই অবিশ্বাস্য যে তার সন্দেহ হল সে সজ্ঞানে আছে তো?

ততক্ষণে সৌরজিতও সেখানে এসে পড়েছে।

সমুদ্রের মধ্যে কোমরজলে রুদ্রকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সৌরজিত হতভম্ব হয়ে গেল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সে কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে। ডেক থেকে মোটা দড়ি তুলে জলের উপর ঝুলিয়ে ডাকতে লাগল,—রুদ্র, রুদ্র, এই দড়ি ধরে উঠে আয়।

আকস্মিক দুর্ঘটনায় রুদ্র এতই শকড্ যে বেশ কয়েকবার ডাকাডাকি করার পর সে দুর্বল হাতে দড়ি চেপে ধরল। সৌরজিত আর অবকাশ ধরাধরি করে রুদ্রকে কেবিনে নিয়ে এল।

রুদ্রর খুব বেশি আঘাত লাগেনি। আচমকা সমুদ্রের জলে পড়ে গিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। হুশ ফিরতে ওর কাছে জানা গেল, ও যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে ওর পায়ের তলায় শক্ত পাথর।

শুনে বিপ্লব আর সৌরজিত মুখ চাওয়া চাওয়ি করল।

একটু ভেবে বিপ্লব বলল,—এখানে নিশ্চয়ই কোন জলমগ্ন দ্বীপ আছে। কিন্তু ম্যাপে নেই কেন?

অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না নৌকার বডির কোন ক্ষতি হয়েছে কি না। কেবিনে অবশ্য সব ওলট-পালট অবস্থা। অল্প কিছু ভাঙচুরও হয়েছে। কিন্তু কোথাও জল ঢোকেনি।

বিপ্লবের নির্দেশে ইদ্রিস ককপিটে ঢুকল। এখনই নিজেদের অবস্থান জানিয়ে বেতারবার্তা পাঠাতে হবে। মাস্তুল ভেঙে পালের যা অবস্থা, তাতে এই নৌকা নিয়ে বালিদ্বীপে পৌঁছোন যাবে কি না বলা মুশকিল।

রেডিওর সুইচ অন করার সঙ্গে সঙ্গে লাল আলো দুবার দপ্ দপ্ করে জ্বলে নিভে গেল। আরও কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করল ইদ্রিস। কিন্তু কোনমতেই রেডিও চালু হল না।

রেডিও অকেজো হয়ে গেছে শুনে সবার মুখ শুকিয়ে কাঠ। যতক্ষণ বেতার সংযোগ ছিল, নিজেদের কখনও অসহায় মনে হয়নি। এখন বিশাল সমুদ্রের মাঝে অজানা জলমগ্ন দ্বীপের উপর ভাঙা-চোরা নৌকোয় বসে, ওরা এই প্রথম ভয় পেল।

কিন্তু ভয় পেয়ে বসে থাকলে চলবে না। এখন তো বিপদের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে লড়াই।

—অবকাশ, তুই নোঙর নামা। নৌকো কোথায় কী অবস্থায় আটকেছে, জানি না। হঠাৎ চলতে শুরু করলে বিপদ আরও বাড়বে।

অবকাশকে এই নির্দেশ দিয়ে বিপ্লব অন্যদের বলল,—সবাই মিলে জেগে থেকে আর কী লাভ হবে? যাও, তোমরা ঘুমোও। বাকি রাতটা আমি ডেকের উপর বসে পাহারা দিচ্ছি।

কার্তিক পূর্ণিমার দিনে যখন সবাই মিলে জলে কলাপাতায় ভেলা ভাসাত, বিপ্লবের মনে তখন তোলপাড় হত। মায়ের মুখে শোনা প্রাচীনকালের অকুতোভয় সওদাগরদের কথা। যারা এই কার্তিক পূর্ণিমার দিনে কলিঙ্গ উপকূল থেকে পাড়ি দিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চিন, আফ্রিকা ও রোমে।

বিপ্লব স্বপ্ন দেখত সে-ও নৌকোয় চেপে সাগর পেরিয়ে যাবে বিদেশের দূর দ্বীপে। গঞ্জাম এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের ছোটখাট অভিযানে অংশ নিয়েছে সে, শিখেছে নৌকোর পাল, দড়িদড়া, কম্পাস, মানচিত্র, আরও নানা নৌ-উপকরণের ব্যবহার। চিনেছে বাতাস ও সমুদ্রস্রোতের চালচলন।

অবকাশ এবং সৌরজিত, দুজনেই ওর এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের সাথী।

ক্লাবই এই অভিযানের আয়োজন করেছে।

ইদ্রিস বিপ্লবের বন্ধু। সমুদ্র-অভিযানের অভিজ্ঞতা ওর নেই। কিন্তু মেরিন রেডিও অফিসার্স কোর্স করেছে। সেইজন্যই ওকে সঙ্গে নিয়েছে বিপ্লব।

এই অভিযানের ষষ্ঠ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, 'খারাবেল'—ওড়িশার ইতিহাসে সবচেয়ে পরাক্রান্ত নরপতি 'খারাবেল'-এর নামাঙ্কিত একটা পাততোলা নৌকো।

এই জলযান তৈরি হয়েছে বিশাখাপত্তনমে। ওপরে টেরিলিনের মজবুত একজোড়া পাল। সামনে জলমগ্ন রাডার, অর্থাৎ হাল। হালের ওপরে স্বয়ংচালিত বায়ুমান যন্ত্র। যেদিকে বায়ুর গতি, হালের মুখ সেদিকে আপনা-আপনি ঘুরে যাবে। মাঝখানে কক্‌পিট, তার তলায় কেবিন। পেছনে রেলিঙঘেরা ডেক।

নৌকোয় শুধু পাল নয়, ছোট্ট ছয় হর্সপাওয়ারের ডিজেল-ইঞ্জিনও আছে। যখন বায়ুপ্রবাহ অনুকূল থাকে না তখনই ইঞ্জিনের দরকার হয়।

সঙ্গে পর্যাপ্ত খাদ্য এবং পানীয় জলও নেওয়া হয়েছে।

কার্তিক পূর্ণিমার দিন গোপালপুরের সমুদ্রতটে মুখ্যমন্ত্রী পতাকা নেড়ে বালি অভিযানের সূচনা করলেন।

ভারত মহাসাগরের বুকে বালিদ্বীপ। বালিদ্বীপে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষের সংখ্যা বেশি। একসময় পার্শ্ববর্তী জাভাদ্বীপেও তাই ছিল। অষ্টম শতাব্দীতে জাভাদ্বীপ শাসন করত প্রতাপশালী শৈলেন্দ্র রাজবংশ। ওখানকার বিখ্যাত বৌদ্ধস্তূপ 'বরবুদুর' এঁদেরই তৈরি।

উপকূল বরাবর নৌকো চালিয়ে গোপালপুর থেকে ওরা এল বিশাখাপত্তনমে। সেখান থেকে মাদ্রাজ। তারপর শুরু হল দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা।

দিনের পর দিন শুরু জলের বুকের উপর দিয়ে ভেসে যাওয়া। পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ওদের ঠেলে নিয়ে চলল গন্তব্যের দিকে।

দু-একটা ঘটনা ছাড়া এ-পর্যন্ত যাত্রা ছিল নির্বিঘ্ন।

নৌকোয় স্নান করার অসুবিধে নেই। হাত বাড়িয়ে সমুদ্র থেকে জল তুলে নিলেই হল। নোনা জলে ব্যবহারের জন্য বিশেষ রকমের সাবানও সঙ্গে আছে।

রুদ্র গা ধুচ্ছিল। জলে বালতি ডুবোচ্ছে, আর মহানন্দে সমুদ্রস্নান করছে। একসময় দেখে ওর হাতে শুধু হ্যান্ডেল, বালতিটা ভেসে যাচ্ছে জলে।

নৌকো ঘোরানো হল। রেলিঙ টপকে নৌকোর ফ্রিবোর্ডে দাঁড়িয়ে বালতি তুলতে হাত বাড়াল অবকাশ। কিন্তু বালতিটা ধরেও তুলতে পারল না। ঝপাং করে নিজেই জলে পড়ে গেল।

মারাত্মক ব্যাপার। নৌকা তখন চলছে, ভাগ্যিস সেফটি হারনেস পরা ছিল। ঘাড়ে ঝোলানো স্কুল ব্যাগের স্ট্র্যাপের মতো দেখতে জিনিসটা, নৌকোর দড়ির সঙ্গে আটকানো। তাই অবকাশ দূরে ভেসে যায়নি। বিপ্লব ছুটে এসে ওকে টেনে তুলে বকাবকি করল,—স্টুপিড, সামান্য একটা বালতির জন্য এক রিস্ক নিতে গেলি?

একদিন রাতে ইদ্রিস ডেকের ওপর পাহারায় ছিল। দৌড়ে এসে বিপ্লবের ঘুম ভাঙিয়ে বলল,—একবার ওপরে আয় তো! ঠিক বুঝতে পারছি না। থেকে থেকে একটা আন্‌ন্যাচারাল আওয়াজ হচ্ছে।

—আনন্যাচারাল?

ডেকে এসে বিপ্লবও শুনল গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ।

রেলিঙের ধারে এসে দাঁড়াতে, ভুস্ করে উঠে এল একটা বিরাট মুখ। গন্ডারের মতো হাঁ করে।

ভীষণ চমকে ওরা পিছু হটে গেল।

সামলে নিয়ে যখন জলের ওপর টর্চের আলো ফেলল, দেখে কিছুই নেই।

টর্চ নিভিয়ে ফেলতে যাবে ঠিক তখনই আবার—

কিন্তু এবার বিপ্লব ভয় পেল না,—দূর! এতো সিল্। বড়ো সাইজের এলিফ্যান্ট সিল্।

মনে রাখার মতো এমন কত ঘটনা!

একদিন যেতে যেতে সমুদ্রের মাঝে এক ভূতুড়ে দ্বীপ দেখে ওরা নৌকো থামাল। জলের ওপর একঘেঁয়ে লাগছিল। তাই একটু ইচ্ছে হল মাটিতে পা ছোঁয়াতে।

নোঙর বেঁধে ওরা চারজন নেমে পড়ল। বিপ্লব রইল নৌকোয়।

ছবিতে চাঁদের পিঠ যেমন দেখতে, এ দ্বীপটা অনেকটা সেইরকম। যেন পাথর গলতে গলতে হঠাৎ জমে গেছে। চারদিকে ছোটোবড়ো গহ্বর। গাছপালা নেই বলে ভূতুড়ে দেখাচ্ছে। মানুষজনও নেই। খুবই ছোটো দ্বীপ।

সৌরজিত বলল—রুদ্র দেখ, এগুলো ঝামাপাথর। কুড়িয়ে নে দু-একটা।

ভারতের উপকূল ছেড়ে সহস্র মাইল দূরে এসে ওরা আবার পেল ভারতের মাটি। বঙ্গোপসাগরের বুকে ভারতের সুদূরতম ভূখণ্ড—নিকোবর। গোপালপুর থেকে বিশাখাপত্তনম যতখানি, নিকোবর থেকে ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপও প্রায় ততটাই।

আর ক'দিনের মধ্যে ওরা পৌঁছে যাবে বালিদ্বীপে।

অভিযান সফল হতে চলেছে এটা যখন ওরা ভাবতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই প্রায় তীরে এসে ঘটল ওই বিপত্তি।

নিকোবর আর সুমাত্রার প্রায় মাঝামাঝি রয়েছে ওরা তখন। এখান থেকে সুমাত্রা-ঘাট-পঁয়ষট্টি মাইলের বেশি হবে না। কোনোরকমে পৌঁছোতে পারলে নৌকো সারিয়ে নেওয়া যেত। কিন্তু ভোরের দিকে নৌকো আরও হেলে পড়ল।

বিপ্লব সঙ্গীদের ডেকে বলল,—সময় থাকতে যদি আমরা নৌকো থেকে বেরিয়ে না পড়ি, তাহলে ভীষণ বিপদে পড়ে যাব।

রুদ্রর আতঙ্ক তখনও কাটেনি। সে বিমূঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন করল—এই মাঝসমুদ্রে আমরা কোথায় যাব আঙ্কল?

—ঘাসড়াস না। ডেকের উপর দুটো প্লাস্টিকের ডিঙি বাঁধা আছে। সৌরজিত আর অবকাশ, যা তোরা ওগুলো রেডি কর। পালগুলো খুলে নে। মাস্তুলটাও নিয়ে নে, দরকার লাগবে। ইদ্রিস আয় আমার সঙ্গে। রুদ্র তুইও আয়। খাবারের টিনগুলো বালিসের ওয়াড়ে ভরে নে। প্লাস্টিকের ক্যানে জল ভরে রাখ্।

অন্তত দিন দশেকের সংস্থান যাতে হয়।

বিপ্লব দুটো দুফ্‌ল ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। চোঙার মতো ক্যাম্বিসের থলে। তাতে আছে মাঝসমুদ্রে টিকে থাকার বহুবিধ সরঞ্জাম—কম্পাস, সেক্সট্যান্ট, অলম্যানাক, পাল সেলাইয়ের জন্য ছুঁচ, মাছ ধরার ছিপ, ছুরি, ফার্স্ট-এড্ বক্স আতসবাজি ইত্যাদি।

এই বিপদের মধ্যেও বিপ্লব ঠাণ্ডা মাথায় সঙ্গীদের নির্দেশ দিচ্ছিল। সে জানে, দলনেতা যদি ভয় পেয়ে ঘাবড়ে যায় তা হলে অন্যদের অবস্থা আরও খারাপ হবে।

ডিঙি দুটো জলে নামানো হল। প্রথম ডিঙিতে উঠল সৌরজিত, ইদ্রিস আর অবকাশ। পাঁচ ছয় ফুট ব্যবধানে কোমরে দড়ি দিয়ে পরস্পর বাঁধা, ডিঙি উল্টে গেলেও যাতে একসঙ্গে থাকতে পারে।

অন্য ডিঙিতে বিপ্লব উঠল রুদ্রকে নিয়ে, একইভাবে দড়ি বেঁধে। আর রইল মালপত্র, প্রত্যেকে লাইফ-জ্যাকেট পরে নিয়েছে।

ডিঙি দুটোও পাশাপাশি বাঁধা হল। যেন শুরু হল এক নতুন অভিযান।

রুদ্র সতৃষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল পরিত্যক্ত নৌকোটার দিকে। সমুদ্রের বুকে এত দিন ওটাই ছিল ওদের ঘরবাড়ি। এখনও ওতে পড়ে আছে ওর সখের গিটারটা।

সমুদ্রে ভাসমান কাঠের তক্তার মতো ঢেউয়ে নাচতে নাচতে ভেসে চলল ডিঙিজোড়া। গায়ে এসে পড়ছে জলের ছিটে।

ডিঙিতে উঠেই ওরা কাজ শুরু করে দিল। ফাইবার গ্লাসের মাস্তুল কেটে দুটো ডিঙির দুদিকে দাঁড় আটকাবার সকেটে লাগিয়ে, পাল খাটাবার ব্যবস্থা হল। পালের বাড়তি কাপড় দিয়ে সুন্দর একটা চাঁদোয়া বানিয়ে ফেলল ইদ্রিস। দিনে রোদ আর রাত হিম থেকে বাঁচা যাবে। এক-একজন পালা করে দাঁড় টানছিল।

বাহ্, এবার মনে হচ্ছে আমরা ডিঙি করেই বালিদ্বীপ পৌঁছে যাব।—ডিঙি দুটো সাজিয়ে ফেলে তৃপ্তির সঙ্গে বলল বিপ্লব।

কিরে রুদ্র, তোর ভয় করছে না?—ইদ্রিস জিজ্ঞেস করল।

—না আঙ্কল, ভয়ের কী আছে? এদ্দিন বড়ো নৌকোয় আরামে বসে ঠিক অ্যাডভেঞ্চারের মজা পাচ্ছিলাম না। এবার—

ভয় পাবে কেন? নৌকোডুবি হয়েছে বলেই যে সলিল-সমাধি হবে তার কোনও মানে নেই। যুদ্ধের সময় তো কত জাহাজডুবি হত। সবাই কি মরত? বেশির ভাগ লোককে হয় অন্য জাহাজ এসে উদ্ধার করত, নয়তো সাঁতরে প্রাণ বাঁচাত।—রুদ্রকে থামিয়ে সৌরজিত বলতে লাগল।

তা হলে শোন্, তোদের এক চিনা নাবিকের গল্প বলি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা। সেই নাবিকের নাম পুন লিম। টরপেডোর আঘাতে ওর জাহাজ ডুবে গেল। সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছিল একটা ছ'ফুট বাই দশফুট কাঠের ভেলা। সেই ভেলায় চড়ে বারশো কিলোমিটার অতিক্রম করে সাড়ে চার মাস পর সে ডাঙায় পৌঁছেছিল জ্যান্ত অবস্থায়।—গল্প জুড়ে দিল অবকাশ।

লোকটা কী খেত?—রুদ্র অবাক হয়ে জানতে চায়।

—সমুদ্রে খাদ্যের অভাব আছে নাকি? জলে কত মাছ, মাঝে মাঝে পাখি-টাখিও পাওয়া যায়। কিন্তু পানীয় জল না থাকলে প্রাণ বাঁচানো মুশকিল। বৃষ্টি হলে তাও পাওয়া যায়।

রুদ্রর মজা লাগছিল অবকাশের কথা শুনতে। সে জানতে চাইল—আঙ্কল, ও মাছ ধরত কীভাবে?

ইম্প্রোভাইজেশন। এ ধরনের বিপদে বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার। হাতের কাছে যা পাওয়া যাবে, তাই দিয়ে লড়তে হবে। টর্চের স্প্রিং, ভেলার পেরেক, একটু বুদ্ধি করে এসব দিয়ে মাছ ধরার হুক বানানো যায়।—প্রত্যয়ের সুরে বলল বিপ্লব।

এইভাবে গল্প করে ওরা আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিচ্ছিল।

সারাদিন চলার পর সূর্যের অবস্থান দেখে সেক্সট্যান্ট আর অলম্যানাকের সাহায্যে বিপ্লব নিজেদের অবস্থান নির্ণয় করার চেষ্টা করল। কিছুটা দক্ষিণদিকে সরে এলেও মোটামুটি ইন্দোনেশিয়ার ভূখণ্ডের দিকেই চলেছে। ডিঙি এখন যে গতিতে যাচ্ছে তাতে কালকেই বালিদ্বীপে পৌঁছানো না যাক, তার আশেপাশে কোথাও পৌঁছে যাবে ওরা। কিন্তু গভীর সমুদ্রে কোনও ভরসা নেই। মাঝে মাঝে এমন বড়ো বড়ো ঢেউ আসছে যে ডিঙি উল্টে যাবার যোগাড়।

রাত দুটোর সময় একটা জাহাজ আসতে দেখা গেল। জাহাজ দেখে ওদের মধ্যে কেউ কেউ বলল,—না, আমরা এই ডিঙিতেই অভিযান কমপ্লিট করব।

কিন্তু বিপ্লব ঝুঁকি নিতে চাইল না। হোক না মোটে দশ-পনের মাইল, তাহালেও সামান্য ডিঙির উপর ভরসা রাখা যায়? বাতাস আর স্রোত যদি ঠিক মতো না পাওয়া যায় তাহলে সব হিসেব গোলমাল হয়ে যাবে।

দলনেতার কথাই মানতে হল।

দুফ্‌ল ব্যাগে যে আতসবাজি ছিল সেগুলো এবার কাজে লাগল। হিস্‌হিস্ করতে করতে সাদা চোখ ধাঁধানো আলো সর্পিলরেখায় উঠে গেল আকাশে। কিছুটা উঠে ফেটে গিয়ে ঝরে পড়ল ফুলঝুরির মতো।

আলোর নিশানা দেখে জাহাজ এগিয়ে এল। বিরাট মালবাহী জাহাজ। জলের ছিটেয় আর বড়ো বড়ো ঢেউয়ের ধাক্কায় ডিঙি দুটোর তখন টালমাটাল অবস্থা।

জাহাজ থেকে দড়ির লম্বা সিঁড়ি নেমে এল। এক এক করে গৌরজিত, ইদ্রিস, অনকাশ সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ওপরে। এবার রুদ্রর পালা।

কী সর্বনাশ। কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে ওঠার পর হঠাৎ রুদ্রর হাত ফসকে গেল। ঝপাৎ করে সে পড়ে গেল সমুদ্রের জলে। এ বিপদের সেখানেই শেষ নয়। কোমরে দড়ি বাঁধা ছিল। সেই দড়ির টানে বিপ্লবও বেসামাল হয়ে পড়ে গেল ডিঙি থেকে।

স্রোতের টানে অন্ধকার সমুদ্রে ওরা ভেসে যেতে লাগল জাহাজের আলো থেকে ক্রমশ দূরে, আরও দূরে। কখনও ঢেউয়ের মাথায়, আবার কখনও ঢেউয়ের গা দিয়ে গড়িয়ে পাক খেয়ে একেবারে জলের মধ্যে। দম বন্ধ হবার উপক্রম।

আঙ্কল। আঙ্কল।—রুদ্র গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল। কিন্তু কোনও সাড়া নেই।

জলে পড়ার সময় জাহাজের গায়ে ধাক্কা খেয়ে বিপ্লব চেতনা হারিয়েছে।

অতটুকু ছেলে হলেও রুদ্র এটা বুঝতে পেরেছে যদি বিপ্লবের জ্ঞান না ফেরে তাহলে দুজনকেই ডুবে মরতে হবে। তাই সে বারে বারে চেষ্টা করে যেতে লাগল বিপ্লবকে জাগিয়ে রাখতে।

যখন সে বুঝল শুধু 'আঙ্কল', 'আঙ্কল' বলে চেঁচালে বিপ্লব চোখ খুলবে না, তখন সে ছলনার আশ্রয় নিল,—ওই দেখো আঙ্কল, একটা জাহাজ আসছে আমাদের উদ্ধার করতে।

ধীরে ধীরে মাথা তুলল বিপ্লব। কই? বলে আবার ঝিমিয়ে পড়ল।

বিপ্লবের সঙ্গে সমানে কথা চালিয়ে গেল রুদ্র। কখনও হাসির গল্প শুনিয়ে, কখনও অদেখা ডাঙার আশ্বাস দিয়ে, কখনও তিমি মাছের ভয় দেখিয়ে ও বিপ্লবকে বাকি রাতটুকু জাগিয়ে রাখল।

যখন ভোরের আলো ফুটল, বিপ্লবের পুরোপুরি হুঁশ ফিরে এসেছে।

—আঙ্কল, আমরা কোন দিকে যাচ্ছি?

—ওসব ভেবে আর কী হবে? এখন শুধু চেষ্টা কর, যতক্ষণ নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারিস। যতক্ষণ আশ, ততক্ষণ শ্বাস।

—আঙ্কল, তুমি ভুল বললে। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

—নারে, ঠিকই বলেছি। যতক্ষণ আশ ততক্ষণই শ্বাস। বেঁচে থাকার আশা হারাসনি।

সূর্য উঠতেই একটু একটু করে কুয়াশা কেটে গেল।

রুদ্র একসময় উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল,—আঙ্কল, ওটা কী? ওটা কী?

পূর্ব দিগন্তে, যেদিকে ওরা চলেছে, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে নীল সমুদ্রের মাঝে একটা সবুজ দ্বীপের রেখা।

কিশোর ভারতী : আষাঢ় ১৪০০